ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি

৯ জুন ২০১৩

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
শাম্মী লায়লা ইসলাম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
সাধন কুমার দাস, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
টিআইবি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org; shammi@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.or

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতাসহ সার্বিকভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির মূল লক্ষ্য। একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সরকারের সহায়ক ভূমিকা পালনে টিআইবি অঙ্গীকারবদ্ধ।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং আইনগতভাবে বাধ্যকরী সর্বজনীন দলিল। দুর্নীতির ব্যাপকতা রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে উপলব্ধি করে এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে এ সনদ প্রণয়ন করা হয়। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি এবং পরবর্তীতে এর সফল বাস্তবায়নের জন্য টিআইবি ২০০৪ থেকে বিভিন্ন প্রচারণা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০০৪ সালের ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরের সমর্থনে গবেষণাভিত্তিক অ্যাডভোকেসি, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা এবং জাতীয় পর্যায়ে জনমত গঠনের মাধ্যমে টিআইবি সরকারকে সনদে স্বাক্ষর প্রদানের জোর দাবি জানায়। এ সনদে অন্তর্ভুক্তির পরবর্তী সময়ে টিআইবি ২০০৭ ও ২০১০ সালে বাংলাদেশে এই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট প্রধান স্টেকহোল্ডারদের (বাংলাদেশ সরকার, ইউএনওডিসি, টিআই ও অন্যান্য) সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেয়। এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এ কার্যপত্রটি প্রণয়ন করেছে।

দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার এ সনদ বাস্তবায়নের সুযোগ ও প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে। এই সনদে সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পর থেকে বাংলাদেশ সরকার সনদ বাস্তবায়নে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথককরণ, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন, তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন গঠন, কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এমন ইতিবাচক নানা পদক্ষেপ সত্ত্বেও সনদের কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মত বাংলাদেশকেও কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সনদ বাস্তবায়নে অপরিহার্য মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যথেষ্ট স্বাধীনতা ও কার্যকরতার অভাব, জনবল ঘাটতি, সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের ঘাটতি, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই ও মূল্যায়নের অভাব ও সর্বোপরি আইনের প্রয়োগের ঘাটতিসহ নানা কারণে সনদ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রভাবমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ঘাটতি ও কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি না হওয়া, রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার, এবং কালো টাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রাখার মতো পদক্ষেপগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধের পথে অন্তরায় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়গুলোসহ এই প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে। বিশিষ করে সনদ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত প্রচেষ্টা তরান্বিত করতে না পারলে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ব্যহত হবে।

এই গবেষণা সার্বিকভাবে পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন শাম্মী লায়লা ইসলাম ও সাধন কুমার দাস। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ফোকাল পয়েন্ট ও সনদ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৪

১.১. কার্যপত্রের উদ্দেশ্য ৪

১.২. কার্যপত্র প্রনয়ণ পদ্ধতি ৪

১.৩. কার্যপত্রের পরিধি ও সীমাবদ্ধতা ৫

২. জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ প্রণয়ন ও বাংলাদেশের অগ্রগতি **৫**

২.১. জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ প্রণয়ন ৫

২.২. জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদঃ উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ৫

২.৩. জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ৬

২.৪. সনদে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ৭

২.৫. সনদ বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ৭

২.৬. কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ৮

৩. সনদ বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়, তার বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ ৯

৩.১ দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ ৯

৩.২ অপরাধ দমন ও আইনের প্রয়োগ ১২

৩.৩ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ১৪

৩.৪ সম্পদ পুনুরুদ্ধার ১৭

৩.৫ রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ১৯

৪. সনদ বাস্তবায়নে সুশীল সমাজের ভূমিকা **২১**

৫. সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ঘাটতির মুখ্য কারণসমূহ **২২**

৬. উপসংহার ও সুপারিশ ২৩

সহায়ক তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী ২৬

পরিশিষ্ট ২৭

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি

১. ভূমিকা

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম আইনগতভাবে স্বীকৃত সার্বজনীন দলিল। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তি এবং পরবর্তীতে এর সফল বাস্তবায়নের জন্য টিআইবি ২০০৪ থেকে বিভিন্ন প্রচারণা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।[১] ২০০৪ সালের ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরের সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা এবং জাতীয় পর্যায়ে জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকারকে সনদে স্বাক্ষর প্রদানের জোর দাবি জানায়। সরকারের সাথে সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অ্যাডভোকেসি, ২০০৭-০৮ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের দাবী ও ভূমিকার ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সনদের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার পরবর্তীকালে এ সনদের বাস্তবায়নের সুযোগ ও প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা ধরনের পদক্ষেপ (কমপ্লাইয়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস (বিসিজিএ), অ্যাকশন প্লান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ইত্যাদি) গ্রহন করা হয়েছ। এ সনদের কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মত বাংলাদেশকেও কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সনদ বাস্তবায়নে অপরিহার্য মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যথেষ্ট স্বাধীনতা ও কার্যকরতার অভাব, জনবল ঘাটতি, সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের ঘাটতি, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই ও মূল্যায়নের অভাব ও সর্বোপরি আইনী সংস্কারের অভাবসহ নানা কারনে সনদ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, প্রচলিত আইন কাঠামোর সংস্কার, আন্তর্জাতিক ফোরামে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ ও সর্বোপরি সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে অন্তর্ভুক্তির পরবর্তী সময়ে টিআইবি ২০০৭ সালে[২] এবং ২০১০ সালে বাংলাদেশে এই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট প্রধান স্টেকহোল্ডারদের (বাংলাদেশ সরকার, ইউএনওডিসি, টিআই ও অন্যান্য) সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেয়। সনদ বাস্তবায়নে নানা ধরনের অঙ্গীকার এবং কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হলেও এর নিয়মিত অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য এখনও তেমন কোনো কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। টিআইবি তার ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনার এই পদক্ষেপ গ্রহন করে।

১.১. কার্যপত্রের উদ্দেশ্য

সাধারণভাবে এ কার্যপত্র প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হল জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের উদ্যোগ, সফলতা, ব্যার্থতা, চ্যালেঞ্জসমূহ তথা সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় এ কার্যপত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- বর্তমান সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং উল্লেখযোগ্য কিছু অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ, সফলতা, ব্যর্থতা, চ্যালেঞ্জ তথা সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং
- সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নযোগ্য নীতিনির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.২. কার্যপত্র প্রনয়ণ পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে এ কার্যপত্রের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের ক্ষেত্রে সনদ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের (আইন মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, ব্যাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ) সাথে সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৭ ও ২০১১ সালের প্যারালাল রিভিউ রিপোর্ট, সরকারি পূরণকৃত সেলফ অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট, রিপোর্ট, কমপ্লাইয়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস (বিসিজিএ), কর্ম-পরিকল্পনা বা অ্যাকশন প্লান, বিভিন্ন আইন,

---

[১] সনদে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রথম দাবী উত্থাপিত হয় ৯ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে যখন টিআইবি ''ইউএন কনভেনশন এগেইনস্ট করাপশন: দ্য ইন্টারন্যশনাল ইন্সট্রুমেন্ট ইন ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট" শীর্ষক এক অ্যাডভোকেসি সেমিনারের আয়োজন করে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, http://www.ti-bangladesh.org/oldweb/Documents/IACDpap-ED-Eng.pdf

[২] টিআইবি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট ২০০৭ ও ২০১০ অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এ প্রেরণ করে।

কৌশলপত্র, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিবেদন, টিআইবির বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ, জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করা হয়েছে। জুলাই ২০১২ থেকে মে ২০১৩ সময়কালের মধ্যে এ কার্যপত্রে তথ্য সংগ্রহ ও কার্যপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৩. কার্যপত্রের পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

এই সনদ বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ, অপরাধ দমন ও আইনের প্রয়োগ, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাই এই কার্যপত্রে সনদ বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় (দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ, অপরাধ নির্ধারণ ও আইনের প্রয়োগ, সম্পদ পুনুদ্ধার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা) এবং তার বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এ কার্যপত্রে বর্তমান সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং সনদ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হলেও সনদের অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্ব ও সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা এ কার্যপত্রে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ায় এই প্রতিবেদনের আওতা সংক্ষিপ্ত রাখতে হয়েছে।

২. জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ প্রণয়ন ও বাংলাদেশের অগ্রগতি

২.১. জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ প্রণয়ন

ক্রমাগত বিশ্বায়নের প্রভাবে কোনো নির্দিষ্ট দেশের দুর্নীতি আর শুধুমাত্র সে দেশের ভৌগোলিক সীমারেখাতেই আবদ্ধ নেই। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধে বহুমুখী জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্রয়াস জরুরি হয়ে পড়েছিল। আর এ লক্ষ্যে দুর্নীতির ব্যাপকতা রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে উপলব্ধি করে এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ প্রণয়ন করা হয়।[৩]

১৯৯৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ঘুষ ও দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ ঘোষণা[৪] গৃহীত হয়। পাশাপাশি ২০০৩ সালে কার্যকর হওয়া জাতিসংঘ আন্তঃদেশীয় সংঘটিত অপরাধ সনদটি[৫] সাফল্যজনকভাবে আলোচিত হয়। এ দুটি সনদেরই মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল দুর্নীতি। সর্বগ্রাসী দুর্নীতি এবং সমাজ ও জনগণের উপর এর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ থেকেই জাতিসংঘ আলাদাভাবে একটি দুর্নীতিবিরোধী সনদ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। এর ফলশ্রুতিতে ২০০০ সালের ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৫৫/৬১ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে সার্বজনীন, বহুমুখী, কার্যকর একটি সনদ, যা আবার যথেষ্ট নমনীয়ও যাতে করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আইনগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্যেও বিষয়টি বিবেচনায় আনা যায় এমন একটি দুর্নীতিবিরোধী সনদ সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি এডহক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। এর দুই বছর পর ২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ৫৮/৪ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং একই বছর ৯-১১ ডিসেম্বর মেক্সিকোর মেরিডায় অনুষ্ঠিত উচ্চ-পর্যায় রাজনৈতিক স্বাক্ষর সম্মেলনে (High-level Political Signing Conference) গৃহীত দুর্নীতিবিরোধী এই সনদটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ৫৮/৪ নং রেজুলেশনের ৬৮(১) অনুযায়ী ২০০৫ সালের ১৪ ডিসেম্বরে সনদটি বলবৎ হয়।[৬] এটিই প্রথম আইনগত-বাধ্যবাধকতাপূর্ণ দুর্নীতিবিরোধী চুক্তি যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জন্য প্রযোজ্য। ২৯ মে ২০১৩ পর্যন্ত ১৪০টি দেশ ও প্রতিষ্ঠান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং ১৬৭টি দেশ ও প্রতিষ্ঠান এই চুক্তির পক্ষভুক্ত হয়েছে।[৭]

এ সনদে একটি প্রস্তাবনা ও আটটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ বিষয়াবলি যেমন: উদ্দেশ্য, শব্দের ব্যবহার, প্রয়োগের সীমা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে প্রতিরোধমূলক উপায়সমূহ, অপরাধ নির্ধারণ ও

[৩] টিআইবি নিউজলেটার ওয়েভস, বর্ষ ১১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭।

[৪] United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r191.htm

[৫] United Nations Convention against Transnational Organized Crime (CTOC) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/

[৬] http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

[৭] http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html, accessed date: 4/6/2013

আইনের প্রয়োগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ পুনুরুদ্ধার, কারিগরি সহযোগিতা ও তথ্য আদান প্রদান, বাস্তবায়নের কৌশলসহ নানা বিষয় বর্ণিত রয়েছে।

২.২. জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ: উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে অধিকতর কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থাসমূহ উন্নীত ও শক্তিশালী করা; সম্পদের পুনরুদ্ধারসহ দুর্নীতি রোধে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং কারিগরি সহায়তাকে সমর্থন, সহযোগিতা ও উন্নীত করা, এবং জনসম্পদ ও সরকারি খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা ও সততা উন্নীত করা। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ একদিকে যেমন দুর্নীতি প্রতিরোধে একমাত্র সার্বজনীন ও বহুমুখী অঙ্গীকার তেমনি আবার যথেষ্ট নমনীয়ও, যাতে করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আইনগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্যের বিষয়টি বিবেচনায় আনা যায়। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এ সনদ কোনো রাষ্ট্রপক্ষকে তার সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে।[৮] এছাড়া সনদের পক্ষভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে যে, তারা তাদের স্ব স্ব দেশে ঘুষ, অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধক অবকাঠামো সমৃদ্ধতর করবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী, তথ্যপ্রদানকারী এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। এই সনদে অনুসমর্থনের ফলে রাষ্ট্র সরকারি-বেসরকারি সেক্টরে দুর্নীতি রোধে নিজস্ব সম্পদ ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সর্বোপরি এই সনদ অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকরতার সাথে দুর্নীতি রোধে শক্তিশালী পন্থা উদ্ভাবনে রাষ্ট্রসমূহকে উৎসাহিত করে।

এ সনদের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো একে অপরকে সহযোগিতা করার বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয় এবং পাচারকৃত অর্থ পুনুরুদ্ধারের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এ সনদ বিচারকার্য ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সমন্বিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান করে। এ ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে ও প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে একত্রে কাজ করার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধে দেশগুলো যেসব কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে সেসব অভিজ্ঞতা বিনিময় করা যায়। প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সফল কার্যক্রমের পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং দুর্নীতি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সাথে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে একযোগে কাজ করা সম্ভব হয়।

২.৩. জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা প্রক্রিয়া

এই সনদে অনুস্বাক্ষরিত বা অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ দুর্নীতিবিরোধী ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা তাদের আইন, প্রতিষ্ঠান এবং বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে। এই সকল পদক্ষেপসমূহ দুর্নীতি প্রতিরোধ, অপরাধ দমন এবং আইন প্রয়োগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, সম্পদ উদ্ধার, কারিগরি সহায়তা এবং তথ্য বিনিময় বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ৬৩ নং অনুচ্ছেদে সনদের লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং তার বাস্তবায়ন তরান্বিত ও পর্যালোচনা করার জন্য সনদের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

২০০৫ সালে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ কার্যকর হওয়ার পরপরই এটা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য "সনদের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন" (সিওএসপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালে পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন ৩/১ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে একটি "স্বচ্ছ, কার্যকর, অনাহূতপ্রবেশমূলক নয়(Non-intrusive), এবং নিরপেক্ষ" পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (Review Mechanism) গ্রহন করে। তারা দুটি পাঁচ-বছর মেয়াদী পর্যালোচনা চক্রের ব্যাপারে একমত হয়। এর মধ্যে প্রথম পাঁচ বছরে তৃতীয় অধ্যায় (অপরাধ নির্ধারণ এবং আইনের প্রয়োগ) এবং চতুর্থ অধ্যায় (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা), এবং দ্বিতীয় পাঁচ বছরে দ্বিতীয় অধ্যায় (প্রতিরোধ ব্যবস্থা) এবং পঞ্চম অধ্যায় (সম্পত্তি উদ্ধার) এর ওপর পর্যালোচনা করা হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ইমপ্লিমেন্টেশন রিভিউ গ্রুপ (আইআরজি), যারা ২০১০ সালে ভিয়েনায় প্রথম বারের মতো সভা করে এবং জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করতে প্রথম পাঁচ বছরের চক্রে মোট ২৬টি দেশের তালিকা তৈরি করে। ২০১২ সালে

[৮] *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ*-এর ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে যে নীতি রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব আইন-কানুন পালন করবে এবং অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

প্রথমবারের মত পর্যায়ক্রমে সদস্য রাষ্ট্রের ইমপ্লিমেন্টেশন রিভিউ গ্রুপ-এর সরকারি প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার ৩/১ প্রস্তাব এবং শর্ত মোতাবেক, সকল সদস্য রাষ্ট্রকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্টের ওপর ভিত্তি করে তাদের দেশের তথ্য সম্মেলন সচিবালয়ে পাঠাতে হবে। এছাড়াও একটি সদস্যরাষ্ট্রকে অন্য দুটি পৃথক সদস্যরাষ্ট্র পর্যালোচনা করবে এবং এই পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে সেই রাষ্ট্রটি তাদের মতামত গ্রহণ করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সচিবালয় পর্যালোচিত দেশের সফলতা, চ্যালেঞ্জ, পর্যবেক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তার দিকগুলো তুলে ধরবে।

পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য এর প্রতিটি স্তরে এবং সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ আবশ্যকীয় করা হয়েছে।[৯] এই সকল সুশীল সমাজ বা এনজিও সনদ বাস্তবায়নে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছে। জাতিসংঘ গণতন্ত্র তহবিল (ইউএনডিইএফ) এর অর্থায়নে দুর্নীতি পর্যবেক্ষণে সুশীল সমাজের ভূমিকা বৃদ্ধির ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিবিও) সনদ বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ করছে এবং প্রচারণা চালাচ্ছে।

২.৪. সনদে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও প্রগতির পথে দুর্নীতি অন্যতম অন্তরায়। দুর্নীতি প্রতিরোধ সরকার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ তথা সাধারণ জনগণের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে অন্তর্ভুক্তির আবশ্যকতা উপলব্ধি করে ২০০৪ সাল থেকে টিআইবি জনগণকে সম্পৃক্ত করে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে জোরালো দাবি করে এসেছে। টিআইবি'র ধারাবাহিক প্রচারণার ফলে সদস্য দেশসমূহের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করার প্রায় তিন বছর পর ২০০৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশ সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সরকার সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ পদক্ষেপসমূহ দেশের নাগরিকদের চাহিদা ও দাবিরই প্রতিফলন। এর মাধ্যমে দুর্নীতি রোধের বিষয়টিকে একটি জাতীয় ইস্যু হিসেবে সরকার প্রাধান্য দিয়েছে। এ সনদে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

২.৫. সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশ ২০০৭ সালে এই সনদে অন্তর্ভুক্তির পর থেকে সরকার সনদ বাস্তবায়নে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সনদের পক্ষভূক্ত কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস সম্পন্ন করে। এপ্রিল ২০০৭ সালে সনদ অন্তর্ভুক্তির তিন মাসের মধ্যে সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সাধন করে। এর জন্য তারা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইজিএস-এর কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব (আইন প্রণয়ন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ) বাংলাদেশে সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অক্টোবর ২০০৭ এবং ডিসেম্বর ২০০৮ এর মধ্যে সরকার এবং আইন মন্ত্রণালয় একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, তথ্য কমিশন গঠন, দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণে উদ্যোগ, জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ সংক্রান্ত সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট পূরণ ও জমাদান, গবেষণা দল গঠন, এবং ওরিয়েন্টেশন ও গবেষণা পদ্ধতির ওপর কর্মশালা আয়োজন। এছাড়াও সরকার একটি ডেস্ক-নির্ভর গবেষণা ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সাথে সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করে।

২০০৯ সালে নির্বাচিত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর, নতুন সরকার সনদ বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং কর্ম-পরিকল্পনা বা অ্যাকশন প্লান অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এছাড়া সরকার একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানায়। উপরন্তু, সরকার ২০১১ সালেও

---

[৯] *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ*-এর ১৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র তার সামর্থ্যের মধ্যে এবং দেশীয় আইনের মৌলিক নীতিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারি ক্ষেত্রের বাইরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং দুর্নীতির অস্তিত্ব, কারণ ও গভীর ক্ষতিকারক ফলাফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যক্তি বা দলগত পর্যায়ে সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা ও সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট নির্ধারিত সময়ে পূরণ করে তা জমা দেয় এবং টিআইবি প্রণীত পরিপূরক বা ছায়া প্রতিবেদনে কিছু ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে। ইরান এবং প্যারাগুয়ের সদস্য এবং ইউএনওডিসি-এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পিয়ার রিভিউ টিম ৮-১৪ এপ্রিল ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ পরিদর্শন করে। তারা মূলত সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশের সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট-এর ওপর পারস্পরিক মত বিনিময় করে। এছাড়া সরকার জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের অধীনে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতা প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ (Central authoritiy) হিসেবে মনোনীত করেছে[১০]। পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতা কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ বহিঃসমর্পণ আইন ও বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত ১০ এর অধিক দেশের সাথে যৌথ আইনগত সহায়তার (Mutual Legal Assistance) চুক্তি করো হয়েছে এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার অনুরোধ আসা শুরু হয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০১২ এর জন্য বাংলাদেশ অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে অর্থ পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে আইনগত সহযোগিতা পাচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশের এগমন্ট গ্রুপের[১১] সদস্য হওয়ার বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সাথে দেশীয় আইনসমূহ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া সরকার সনদের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯, গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) আইন ২০০৯, ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন ২০০৯, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) প্রদান আইন ২০১১ ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পাম্পরিক সহায়তা আইন ২০১২ প্রণয়ন, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এবং সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট-এর সংস্কার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগসহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২.৬. কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা

জানুয়ারী ২০০৮ এ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সনদের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কমপ্লাইয়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস শেয়ার করা হয়। এই অ্যানালাইসিস অনুযায়ী আইন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত দুর্বলতা ও ঘাটতিসমূহ দূর করার লক্ষ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ণের কথা বলা হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি ব্যবহারিক দিক-নির্দেশনা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনা সনদের সাথে সংগতি বিধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পূরণ ও সনদ বাস্তবায়নে অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি কাঠামো প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ণের পূর্বে চারটি মূল নির্দেশক বা ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তার আলোকে বিশদভাবে কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়। এছাড়া কর্মপরিকল্পনায় কর্মসূচী ও নির্দেশকের বিপরীতে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কে হবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ কর্ম-পরিকল্পনায় প্রথমে চারটি মূল ইস্যু বা ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি মূল ইস্যুর অধীনে আবার কিছু উপ-ইস্যু নির্ধারণ করে তারও প্রতিটির অধীনে কিছু কর্মসূচী ও নির্দেশক চিহ্নিত করে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। তবে বাস্তবে কর্ম-পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকরতার ক্ষেত্রে। এ কর্ম-পরিকল্পনার মূল নির্দেশকগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গৃহীত হলেও কিছু ক্ষেত্রে এ কর্ম-পরিকল্পনা অনুসরণ ও সফল বাস্তবায়নের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদানের জন্য আইনী বিধানের প্রবর্তন, বিদেশে পলাতক আসামীকে দেশে ফিরিয়ে আনা বিষয়ক আইন পর্যালোচনা, পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার জন্য আইনগত ভিত্তি প্রর্বতন ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে। এছাড়াও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে অতি সম্প্রতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে, দুর্নীতি দমন আইনের পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ পর্যালোচনা, সিভিল সার্ভিস আইন প্রনয়ণ, সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, জবাবদিহিতার চর্চা এবং তদারকি ভূমিকা পালন, জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ ও এর বাস্তবায়নের অগ্রগতির তথ্য একটি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, সুশীল সমাজ ও সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণসহ আরো কিছু বিষয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। (বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট-১) এছাড়া কর্ম-পরিকল্পনার

[১০] বিস্তারিত জানতে দেখুন, Government of Bangladesh, *"UNCAC – A Bangladesh Action Plan for Compliance"*, November 2009.

[১১] এগমন্ট গ্রুপ অফ ফাইনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ১৯৯৫ সালে আন্তর্জাতিক সহায়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন দেশের ফাইনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটগুলোর একটি গ্রুপ

অধিকাংশ কর্মকান্ডই ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও কর্ম-পরিকল্পনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে অনেক কার্যক্রমই উক্ত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয় নাই।

৩. সনদ বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় এবং তার বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

৩.১. দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের অনুচ্ছেদ ৫-এ দুর্নীতি দমনের নীতিমালা ও কার্যক্রমসূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়ন [৫(১)][১২], সদস্য রাষ্ট্রের দুর্নীতি রোধে কার্যক্রম গ্রহণ [৫(২)][১৩], দুর্নীতি সংক্রান্ত আইনের মূল্যায়ন [৫(৩)][১৪] এবং দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহায়তা [৫(৪)][১৫] সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সনদের অনুচ্ছেদ ৬-এ দুর্নীতি প্রতিরোধক সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রধান কার্যক্রম [৬(১)][১৬], উক্ত সংস্থার স্বাধীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি [৬(২)][১৭] সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.১.১. বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর সাথে বাংলাদেশের আইনী কাঠামো মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায়। এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানকারী আইনসমূহ হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭, দন্ডবিধি ১৮৬০, ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (সংশোধন) ১৯৫৮। এই সরকার দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২' এবং 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন ২০১১' প্রণয়ন করে। এছাড়াও একটি তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়াও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে অতি সম্প্রতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

নবম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দুর্নীতি দমন রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, এবং প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমনকে অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে প্রাধান্য দেয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অগ্রাধিকারের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল অন্যতম।[১৮] বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শীর্ষ পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে[১৯] নির্বাচনী ইশতেহারের বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। বিভিন্ন

---

[১২] *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ-এর* অনুচ্ছেদ ৫(১) অনুযায়ী, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র, তার আইন ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী, কার্যকর এবং সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে যা সমাজের অংশগ্রহণকে উন্নত করবে এবং আইনের শাসন, জনসম্পদ এবং জনসংযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতির প্রতিফলন ঘটাবে।

[১৩] *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ-এর* অনুচ্ছেদ ৫(২) অনুযায়ী, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র দুর্নীতি রোধ করতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং সেটি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

[১৪] *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ-এর* অনুচ্ছেদ ৫(৩) অনুযায়ী, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে দুর্নীতি রোধ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আইনগত দলিল প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধকল্পে যথেষ্ট কিনা সেটি মূল্যায়ন করবে।

[১৫] *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ-এর* অনুচ্ছেদ ৫(৪) অনুযায়ী, সদস্য রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রীয় আইনের মূলনীতি অনুসারে এবং উপযোগীতা অনুযায়ী অপরাপর রাষ্ট্র ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করবে। এই ধরনের সহযোগিতার মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহে অংশগ্রহণও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

[১৬] *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ-এর* অনুচ্ছেদ ৬(১) অনুযায়ী, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র, তার আইন ব্যবস্থার মৌলিক নীতি অনুযায়ী দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করবে। এসব সংগঠন নিম্নোক্ত উপায়ে দুর্নীতি দমন করবে:
ক) এই সনদের ৫ ধারা মোতাবেক প্রণীত সব নীতির বাস্তবায়ন করবে ও প্রয়োজনে এগুলোর সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করবে; এবং খ) দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এং প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

[১৭] *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ-এর* অনুচ্ছেদ ৬(২) অনুযায়ী, প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র এই অনুচ্ছেদের ১ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত দুর্নীতি প্রতিরোধে সৃষ্ট সংগঠন বা সংগঠনসমূহকে রাষ্ট্রীয় আইনের মূলনীতি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দেবে যাতে এই সংগঠন বা সংগঠনসমূহ যথাযথভাবে কোন অনুচিত প্রভাব ছাড়াই কাজ করতে পারে। উপরন্তু প্রয়োজনীয় উপকরণ, দক্ষ কর্মী ও সেই সাথে কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যেন তারা সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারে।

[১৮] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। এ প্রসঙ্গে নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়, "দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দিতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ... (প্যারা ২)।"

[১৯] জাতীয় সংসদে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)।

সময় সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরাও একই আশ্বাস দেন। ২০০৯ সালের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার সরকারের কঠোর অবস্থানের বিষয়টি পুনরায় তুলে ধরেন।[২০]

দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা: দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন, স্বশাসিত এবং নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) স্বাধীন ও কার্যকর করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্বাচনী অঙ্গীকার। দেশে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের অন্যতম শর্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যসব সহায়ক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা।

২০০৯ সালের ২৪ জুন দুদকে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়। কাজে যোগ দিয়ে নতুন চেয়ারম্যান জানান দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুদক আপোস করবে না এবং সরকারের দিক থেকেও তার ওপর কোনো ধরনের চাপ নেই। তবে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে তার বক্তব্যে দুদকের ওপর সরকারের চাপের কথা প্রকাশ পায়। সরকারের দুদক আইন সংশোধনের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, “দুদক এমনিতেই দন্তহীন বাঘ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে থাবা দিয়ে দুদক কাজ করত, থাবার সেই নখগুলোও এখন কেটে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।”[২১]

ক্ষমতা গ্রহণের পর সংসদে ও তার বাইরে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়সহ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দুদকের কার্যক্রমের ব্যাপক সমালোচনা হয়, যার প্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ২৬ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদের সভায় ‘দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪’ এর সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর পর টিআইবিসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের প্রতিবাদ ও দেশব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচির পর তিনজন মন্ত্রীর সমন্বয়ে বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনার জন্য একটি কমিটি করা হয়। কিন্তু দুদক বা অন্য কোনো স্টেকহোল্ডারকে কোনোভাবে সম্পৃক্ত না করেই উল্লিখিত সংশোধনী আবার অনুমোদন করা হয়। এসব সংশোধনী ২০১১ সালের ২৪ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদিত হওয়ার পর ২৮ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ‘দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১১’ সংসদে উত্থাপন করেন। কিন্তু এখনও এ আইনটি সংসদে পাস হয়নি।

এ বিলটি আইনে পরিণত হলে দুদকের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে খর্ব হবে বলে বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, সরকারের পক্ষ থেকে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে কমিশনের সব কাজে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আইনগতভাবে দুদক সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, এবং দুদকের ক্ষমতা খর্ব হবে যা সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রস্তাবিত আইনে বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতার প্রস্তাব করা হয়েছে। মামলা করার পূর্বশর্ত হিসেবে এই অনুমতির অনুলিপি প্রদান করতে হবে। এর অর্থ হলো, সরকারি খাতের দুর্নীতির বিষয়টি সার্বিকভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে থেকে যাবে। টিআইবি পরিচালিতি একটি জনমত জরিপে (২০১০)[২২] দেখা যায়, সরকারের এই প্রস্তাবের প্রতি ৭৩% উত্তরদাতার সমর্থন নেই। এছাড়া সংশোধনী অনুযায়ী সরকার দুদক–এর সচিব নিয়োগ প্রদান করবে। তা ছাড়া সচিবের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণেও দুদক–এর কোনো ভূমিকা থাকবে না। এই বিধান দুদক এর স্বাধীনতাকে সীমিত করবে এবং কমিশনের উপর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। সংশোধনী প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে যে কমিশন দুর্নীতি বিষয়ক কোনো অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্ত চলাকালে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, সরকার বা সরকারের অধীনস্ত কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা থেকে যে কোনো প্রতিবেদন বা তথ্য চাইতে পারবে এবং যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চাহিত প্রতিবেদন বা তথ্য পাওয়া না যায়, তাহলে কমিশন নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্ত সম্পন্ন করতে পারবে। এর অর্থ কোনো সরকারি, আধা–সরকারি অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কমিশনকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে না। এছাড়া প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী দুদক কোনো সাক্ষীর প্রতি সমন বা হাজিরা অথবা গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করতে পারবে না। বরং সে ক্ষেত্রে কেবল উপস্থিতি

[২০] *ডেইলি স্টার*, ১০ ডিসেম্বর, ২০০৯।

[২১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ অক্টোবর ২০০৯।

[২২] ২০১০ সালে টিআইবি পরিচালিত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর সংশোধন প্রস্তাবনার ওপর জনমত জরিপে সারা দেশে ছয়টি বিভাগের অধীনে ২৯টি জেলা এবং ৭টি উপজেলায় ৩,৯৯৮ জনের মধ্যে একটি জনমত জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপে সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, পেশাজীবী (শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী ও সাংবাদিক), রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং সাধারণ জনগণের (ব্যবসায়ী, ছাত্র, গৃহিণী, সাংস্কৃতিক কর্মী) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

নিশ্চিত করার নোটিস পাঠাতে পারে। এটি কমিশনের তদন্ত করার ক্ষমতাকে খর্ব করবে।[২৩] দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধনের জন্য সরকারের প্রস্তাবনার প্রতি সার্বিকভাবে সমর্থন জানায়নি ৫৭% উত্তরদাতা। তাই টিআইবি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ও অন্যদিকে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সংসদ সদস্য ও গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সব স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্ত করে সরকারকে তার অবস্থান থেকে কিছুটা হলেও সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং কমিশনের গতিশীলতায় ঘাটতি ঘটেছে।[২৪]

দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশনে জনবলের ঘাটতি ছিল। দুদক'কে কার্যকর করতে দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের খুব বেশি তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। ২০১১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দুদকের দুইজন কমিশনারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর একটি বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৩ মার্চ দুইজন কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয়। এবং ২০১৩ ২৩ জুন দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষ হবে। এক্ষেত্রে এই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে হবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে দুদক আইন অনুযায়ী নির্ধারিত প্রয়োজনীয় পেশাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। একই সাথে বাছাই কমিটিসহ দুদকের চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বাছাই ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অহেতুক সময়ক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হলে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা দুদকের মত প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ হতে পারে। বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১০৭৩ জন। অল্প কিছু সংখ্যক পদ খালি রয়েছে এবং সম্প্রতি ১১টি সহকারি পরিচালক ও উপসহকারি পরিচালক পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনগত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দুদকের অধিকাংশ কর্মচারী দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সময় থেকে বহাল আছেন, যাদের কর্ম-ইতিহাস যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়াই ঢালাওভাবে দুদক-এ আত্তীকরণ করা হয়। এর ফলে দুদকের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আসছে। সম্প্রতি দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। দুদক ছাড়াও একটি গোয়েন্দা সংস্থা কমিশনের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম: নানা সীমাবদ্ধতা স্বত্তেও দুর্নীতি দমন কমিশন দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে নানা ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে অনুসন্ধান ও তদন্ত কারা ছাড়াও কমিশন সারা দেশে দুর্নীতি বিরোধি গণসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রায় ৪৫০ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে, প্রায় ১২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা সংঘ (Integrity Unit) গঠন করেছে। সততা সংঘ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন, সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‌্যালিসহ নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহন করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানিক অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য কমিশন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করেছে এবং প্রতিষ্ঠানিক অনুসন্ধান টিম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশন তাদের কার্যক্রম সহজীকরণের নিমিত্তে ডিজিটাইজেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে এখন কমিশনের ই মেইলে আভিযোগ প্রেরণ করা যাবে।[২৫]

দুর্নীতি প্রতিরেধে সরকারি বেসরকারি নানা পদক্ষেপ স্বত্তেও দেশে এখনও দুর্নীতির ব্যপকতা ও গভীরতা উদ্বেগজনক। টিআইবির ২০১২ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী সার্বিকভাবে অধিকাংশ খাতেই আগের বছরের তুলনায় দুর্নীতি কমলেও বাংলাদেশের ৬৩.৭% খানা বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি খাত বা প্রকিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ভোগলিক অবস্থান ভেদে দুর্নীতির মাত্রা গ্রামাঞ্চলে বেশি, যা এ সমস্যার গভীরতা ও ব্যপকতার উদ্বেগজনক অবস্থার প্রতিফলন। এ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য প্রাক্কলনে দেখা যায় বাংলাদেশের খানাগুলো জরিপকৃত সেবা খাতে বছরে প্রায় ২১,৯৫৫.৬ কোটি টাকা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে যা ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৩.৬% এবং জিডিপি'র ২.৪%। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও এডিবি আয়োজিত সুশাসন বিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে দেশে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা ও আইনের শাসনের অভাব এবং এর ফলশ্রুতিতে সুশাসনের অনুপস্থিতির বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে: "দেশের সব জায়গায় দুর্নীতি। বিচার, প্রশাসন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, কর আদায়কারী সংস্থা থেকে শুরু করে থানা পর্যন্ত এই দুর্নীতি বিস্তৃত। দেশে সুশাসন না থাকার অন্যতম দুই কারণ হচ্ছে দুর্নীতি এবং আইনের শাসনের অভাব।"[২৬] দুর্নীতি দমনে সরকারের অঙ্গীকার

---

[২৩] কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন, পলিসি ব্রিফ, টিআইবি।

[২৪] 'টিআইবি কি ম্রিয়মাণ?', ইফতেখারুজ্জামান, *দৈনিক আমার দেশ*, ১৬ জুলাই ২০১২।

[২৫] ত্রৈমাসিক দুদক দর্পণ, জুলাই, ২০১২

[২৬] *প্রথম আলো*, ২০ মে ১০১২।

থাকলেও দুর্নীতি দমন কমিশনকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা, দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি না করা, আইনী সংস্কারের মাধ্যমে দুদক-কে দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ, সরকারি দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতির মামলা খারিজ, এবং কালো টাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রাখার মতো পদক্ষেপগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধের পথে অন্তরায় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তাইতো টিআইবি জনমত (২০১০) জরিপে ৮৬% উত্তরদাতা বলেছেন যে, দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকার সফল হয় নি।[২৭]

৩.২. অপরাধ নির্ধারণ ও আইনের প্রয়োগ

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫ থেকে ৪২ নং অনুচ্ছেদে অপরাধ নির্ধারণ ও আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সনদের ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ নং অনুচ্ছেদগুলোতে দেশীয় ও বৈদেশিক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণ, সম্পত্তি আত্মসাৎ, অপব্যবহার বা অন্যান্য স্থানান্তর, প্রভাব বাণিজ্য, কর্তব্যের অপ্যব্যবহার এবং অবৈধ উপার্জন বিষয়ে উল্লেখ আছে। এছাড়া সনদের ২১-২৬ নং অনুচ্ছেদগুলোতে বেসরকারি খাতে ঘুষ গ্রহণ, সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ, অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের পাচার, গোপন করা, ন্যায় বিচারের প্রতিবন্ধকতা এবং আইনগত ব্যক্তির দায়ভারের বিষয় উল্লেখ আছে। এছাড়া সনদেরর ৩৬ নং অনুচ্ছেদে বিশেষ কর্তৃপক্ষের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ আইন কাঠামোর মৌলিক নীতি অনুসারে এমন বিশেষ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব নিশ্চিত করবে যারা আইন প্রয়োগের মাধ্যম দুর্নীতি রোধ করবে। এরূপ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ও যে কোনো অনুচিত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য সদস্য রাষ্ট্রের আইনগত কাঠামোর মূলনীতি অনুসারে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। এছাড়া অনুচ্ছেদ ৩৭ এ আইন বলবৎকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা, অনুচ্ছেদ ৩৮ এ জাতীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সহযোগিতা এবং অনুচ্ছেদ ৩৯ এ জাতীয় কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি খাতের মধ্যকার সহযোগিতার বিষয়ে বলা হয়েছে।

৩.২.১. বাস্তবতা

বাংলাদেশের আইনসমূহের জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের অপরাধ দমন ও আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত অধিকাংশ অনুচ্ছেদের সাথে সংগতিপূর্ণ। এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানকারী আইনসমূহ হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭, দন্ডবিধি ১৮৬০, ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (সংশোধন) ১৯৫৮, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২।

জাতিসংঘ সনদের ২৩ নং অনুচ্ছেদে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের পাচার বিষয়ে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনটিতে বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে। পাচার বিষয়টিকে চিহ্নিত করার জন্য এই আইনে অর্থ পাচারকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ২২টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইনটি অর্থ পাচার প্রতিরোধে সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই আইনের কার্যকর প্রয়োগ সহজতর করার জন্য সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকে (দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক) একটি অর্থ পাচার প্রতিরোধ ইউনিট স্থাপন করেছে।

এছাড়া, জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বৈদেশিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণ বিষয়ে উল্লেখ আছে। কিন্তু বাংলাদেশে বৈদেশিক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী ও আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণের অপরাধ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। তবে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ২ ধারায় বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অপরাধ সংঘটনকারী যেকোনো ব্যক্তি অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। এই আইনের আওতায় সীমিত আকারে বৈদেশিক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী ও আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণের মামলাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের এই অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত সরাসরি ও সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। এছাড়া জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ৩২ নং অনুচ্ছেদের সাথে সংগতি বিধান করার জন্য সাক্ষ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা বিষয়ে আইন প্রণয়নের বিষয়টি আলোচনাধীন থাকলেও আইনটি এখনও প্রণীত হয়নি।

দুর্নীতির মামলাসমূহের যথাযথ নথিবদ্ধকরণের অভাব, তথ্য প্রাপ্তির অপ্রতুলতা, এবং তথ্যের হালনাগাদকরণের অভাব জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ সংক্রান্ত আইনগত বিধানসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা বা বাধার সৃষ্টি করছে। সনদ বাস্তবায়নের সাথে

[২৭] প্রাগুক্ত

জড়িত প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতির মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। তবে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনের আওতায় অপরাধ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনের প্রয়োগ করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের জানুয়ারী/২০০৭ হতে ডিসেম্বর/২০১২ ইং পর্যন্ত বছর ভিত্তিক সম্পদের বিবরণী নোটিশ জারী, অনুসন্ধান, নথিভূক্ত, এফ আই আর, সি এস এবং এফ আর এর মোট পরিসংখ্যানসমূহ নিম্নরূপঃ

সারণি ১: দুর্নীতি দমন কমিশনের জানুয়ারী/২০০৭ হতে ডিসেম্বর/২০১২ ইং পর্যন্ত সম্পদের বিবরণী নোটিশ জারী, অনুসন্ধান, নথিভূক্ত, এফ আই আর, সি এস এবং এফ আর এর মোট পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিষয়	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	মোট
১	সম্পদের বিবরণী নোটিশ জারী	-	১০৪	১০২৭	১৪২	১৯২	১১৬	৬৮১
২	অনুসন্ধান	৫৫০	৮১৭	১২০২	৯৭৩	১৩১৮	১৮৪২	৬৭০২
৩	নথিভূক্ত	৭৩	২২৫	৩৫৬	৪১২	৪০৬	১০৪৭	২৫৪৯
৪	এফ আই আর	৭০১	৯৭৯	২৩৪	২৭৩	৩৬৬	৫২১	৩০৭৪
৫	সি এস	১৭০	৩৯৭	৪৭৫	৫৩৬	৬১৬	৫৮৮	২৭৮২
৬	এফ আর (ফাইনাল রিপোর্ট)	৮০	১৯৭	২৬২	২৮৫	২৯৯	৩৮২	১৫০৫

*দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সংগৃহীত তথ্য

সারণি ১ এ দেখা যাচ্ছে যে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক মোট ৬৮১টি সম্পদের বিবরণী নোটিশ জারী করা হয়েছে, ৬৭০২টি অনুসন্ধান করা হয়েছে, ৩০৭৪টি এফ আই আর বা মামলা দায়ের করা হয়েছে, ২৭৮২ টি মামলার চার্জ শীট এবং ১৫০৫টি মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন বা ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে নিচের সারণি ২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশের বিভিন্ন বিচারিক আদালতে দুর্নীতি দমন কমিশনের বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২১১৮টি। এরমধ্যে ১৭২০টি মামলার বিচার চলমান অবস্থায় আছে এবং ৪০১টি মামলার বিচার স্থগিত আছে। অপরদিকে, মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৩১টি যার মধ্যে ৪২টি মামলায় অভিযুক্তের সাজা হয়েছে এবং ৮৯টি মামলায় অভিযুক্ত খালাস পেয়েছে। এছাড়া পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায় যে এখন পর্যন্ত যে দেশের বিভিন্ন বিচারিক আদালতে বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ১২৩২ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে

সারণি ২: ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বিচারিক আদালতে দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলার পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

বিবরণ	ঢাকা	ঢাকার বাইরে	মোট
বিচারাধীন	৫২৭	১৫৯১	২১১৮
বিচার চলমান	৩৫৯	১৩৫৮	১৭১৭
বিচার স্থগিত	১৬৮	২৩৩	৪০১
সাজা	১৭	২৫	৪২
খালাস	৫৮	৩১	৮৯
মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্য	৭৫	৫৬	১৩১

*দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সংগৃহীত তথ্য

সারণি ৩: ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বিচারিক আদালতে বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলার পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

বিবরণ	ঢাকা	ঢাকার বাইরে	মোট
বিচারাধীন	৪০৪	৮২৮	১২৩২
বিচার চলমান	৩০১	৬০৩	৯০৪
বিচার স্থগিত	১০৩	২২৫	৩২৮
সাজা	০৩	১২	১৫
খালাস	২৬	৪৫	৭১

মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	২৯	৫৭	৮৬

*দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সংগৃহীত তথ্য

অন্যদিকে ২০১১ সালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থনৈতিক তদন্ত বিভাগ প্রায় ৬০০টি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন পেয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে ১১৫টি মামলা বিভিন্ন তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানের (পুলিশ) নিকট এবং ২০০টি মামলা দুর্নীতি দমন কমিশনের নিকট তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান এই ১১৫টি মামলার ওপর (সারণি ৪)।

সারণি ৪: বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থনৈতিক তদন্ত বিভাগের দায়েরকৃত মামলা

বিচারাধীন	১০২টি মামলা
খারিজ	৩টি মামলা
নিস্পত্তিকৃত	১০টি মামলা

* বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২০১১ সালে সংগৃহীত তথ্য: সার্বিক তথ্য পাওয়া যায় নি

সারণি ৫ অনুসারে, ২০০৭ হতে ২০১০ সালের মধ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯ এর ২(ট), (ণ) এবং (থ) ধারায় মামলা হয়েছে মোট ১৮টি। এর মধ্যে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে ৫টির।

সারণি ৫: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯ এর ২(ট), (ণ) এবং (থ) ধারা সংক্রান্ত মামলা

বছর	২০০৭-১০
মামলার সংখ্যা	১৮
চার্জশীটের সংখ্যা	৫

* দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে ২০১১ সালে সংগৃহীত তথ্য; সার্বিক তথ্য পাওয়া যায় নি

সরকারের প্রতিটি বিভাগে সঠিক ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থা না থাকা, আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের অভাব এবং গোপনীয়তার সংস্কৃতির জন্য উপরে উল্লিখিত বিষয়ে পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় নি। এছাড়াও আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র এই সকল তথ্যে উঠে আসে না। এই বিষয়ে মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রে আইনের শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হওয়ায় আইনের সঠিক প্রয়োগ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়। অনেকক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের বা মামলার সংখ্যা কম হয়, দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলে, অনেক মামলা তথ্যাভাবে স্থগিত বা খারিজ হয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা প্রভাব মামলা পরিচালনায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে প্রকৃত অপরাধী অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তি পায় না। এছাড়া কমিশনের মামলা যখন আদালতে যায় তখন কমিশনকে পক্ষ করার নিয়ম থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে পক্ষ করা হয়। এসকল ক্ষেত্রে মামলা পরিচালনায় নানা ধরনের সমস্যা বা জটিলতার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে অপরাধ নির্ধারণ ও আইন প্রয়োগ করে মূলত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দুদক। বাংলাদেশ আওয়ামী লাগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে মূলত পুলিশকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করে।[২৮] এ লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এদের বিরুদ্ধে বিচারহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সহ বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে, এবং এ সংস্থা সমূহে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে অপরাধ দমনে আইনের সঠিক প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রে হচ্ছে না।[২৯]

[২৮] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "জনজীবনে নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে" (প্যারা ৫.৭)।

[২৯] রুমানা শারমিন, ফাতেমা আফরোজ, সাধন কুমার দাস, ও শাহজাদা এম আকরাম, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, টিআইবি, ২০১২।

৩.৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ১১ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ কথা স্মরণ রেখে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র, তার আইন ব্যবস্থার মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করে, বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সব সদস্যদের মধ্যে সততা বৃদ্ধি এবং তারা যাতে দুর্নীতি করার সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা করবে। এই ব্যবস্থাসমূহ বিচার বিভাগের সদস্যদের জন্য প্রণীত আচরণ বিধিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

৩.৩.১. বাস্তবতা[৩০]

বাংলাদেশ সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। এছাড়াও সংবিধানে উচ্চ আদালতের সুপারিশক্রমে অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ ও তাদের পদোন্নতির বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে।[৩১] উল্লেখ্য বহুল উদ্ধৃত রাষ্ট্র বনাম মাজদার হোসেন মামলায়ও সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রায় প্রদান করে এবং সরকারকে তা বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দেয়। বিচার বিভাগ পৃথক করার বিষয়ে পরপর দুটি রাজনৈতিক সরকার (সপ্তম ও অষ্টম সংসদের মেয়াদে) এবং মধ্যবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২২ বার সময় চাওয়া হয়। এছাড়া এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ যাচাই করার জন্য সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ের আবেদন মুলতবি রাখা হয় ছয় বার। এভাবে মোট ২৮ বার সময় দেওয়ার পর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।[৩২] গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এসব পদক্ষেপের ফলে ২০০৭ এর ১ নভেম্বর বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হয়। এজন্য 'দি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ২০০৭', 'জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭', 'জুডিশিয়াল সার্ভিস পে কমিশন বিধিমালা ২০০৭', 'জুডিশিয়াল সার্ভিস (নিয়োগ, প্রত্যাহার, বহিষ্কার প্রভৃতি) বিধিমালা ২০০৭' এবং 'জুডিশিয়াল সার্ভিস (পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং চাকরির শর্তাবলী) বিধিমালা ২০০৭' জারি করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিচার বিভাগ পৃথককরণের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন এবং বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণে বর্তমান সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৯' অনুমোদন এবং ২১৫ জন সহকারী জজ/ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে এবং বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।[৩৩] ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৩৪] ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিচার প্রার্থীদের দুর্ভোগ নিরসন ও বিচার ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও নতুনত্ব আনার জন্য সরকার ও বিচার বিভাগ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু অগ্রগতি অর্জন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ। অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন ও তা কার্যকর হওয়া।
- প্রধান বিচারপতির সম্পদের বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং অন্যান্য বিচারপতিদের সম্পদের বিবরণী প্রদানের আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক বিচারপতির সম্পদের বিবরণী প্রধান বিচারপতির নিকট প্রদান।
- সুপ্রীম কোর্টে মামলা আদালতে তুলতে এবং আদেশের কপি ও নথি সংশ্লিষ্ট শাখায় না পাঠিয়ে কারসাজি করাসহ বিভিন্ন অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জামিনজনিত দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন।[৩৫]

---

[৩০] বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ওপর বর্তমান বাস্তবতা নিরীক্ষা করে সম্প্রতি টিআইবি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই কার্যপত্রে উপস্থাপিত তথ্যগুলোও মূলত এই প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, রুমানা শারমিন, ফাতেমা আফরোজ, সাধন কুমার দাস, ও শাহজাদা এম আকরাম, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, টিআইবি, ২০১২।

[৩১] *বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১৫-১১৬।

[৩২] *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১ নভেম্বর ২০০৭।

[৩৩] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর ... করা হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ... করা হবে (প্যারা ৫.২)।" "যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে" (প্যারা ৫.১)।

[৩৪] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৮ জানুয়ারি ২০০৯। আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এবং ব্রিটিশ কমিশনারের সাথে এক সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশের বিচার বিভাগ এখন নিজস্ব গতিতে চলবে। সরকার তাতে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবে না"।

[৩৫] হাইকোর্টে দুর্নীতি রোধে নতুন নীতিমালা, *দৈনিক সমকাল*, ৮ জানুয়ারি ২০১০।

- বিভিন্ন আদালতে মামলাজট কমাতে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করার জন্য দেওয়ানী এবং ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।[৩৬]
- উচ্চ আদালতে অব্যবস্থাপনা ও মামলার নথিপত্র সংরক্ষণে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ।[৩৭] সুপ্রীম কোর্টে মামলা ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনতে ও তদারকি বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-রেজিস্টারিং পদ্ধতি চালু।[৩৮]
- আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি।
- বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি। সুপ্রিম কোর্টে আগত বিচারপ্রার্থীদের অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন ইত্যাদি।[৩৯]

এছাড়া দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন বিল পাশ করা হয়েছে যা বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও বিড়ম্বনা অনেকাংশে কমাবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধি ১৯৯৮ এর সংশোধনীর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসকল উদ্যেগ স্বত্তেও মামলা জট, মামলা পরিচালনায় সময়ক্ষেপণ ও বিচারক সংকট বিচারিক সুবিধা পাওয়ার বিষয়কে দারুণভাবে ব্যহত করছে। যদিও বিচারক সংকট সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের নিম্ন ও উচ্চ আদালতগুলোতে সরকার বিচারক নিয়োগ করেছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে বিচারক সংখ্যা ১০৪ (হাইকোর্টে ৯৮ এবং সুপ্রীম কোর্টে ৬ জন)। এছাড়া বিচার প্রার্থীদের দুর্ভোগ নিরসনে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১-এ ধারায় মামলার শুনানি, জেল আপিল শুনানি এবং ডেথ রেফারেন্সের (মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিতকরণ) জন্য পৃথক বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। হাইকোর্টের দুটি বেঞ্চকে ৫৬১-এ ধারায় ২০০৯ এবং ২০১০ সালের মামলা শুনানিও নিষ্পত্তির এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। জেল আপিল শুনানির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ২৭টি বেঞ্চকে। সংশ্লিষ্ট বেঞ্চকে ১০টি করে মামলা নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া হয়েছে। ৫৬১-এ ধারার অধীনে নতুন মামলা শুনানির জন্য ছয়টি বেঞ্চকে, ডেথ রেফারেন্সের জন্য দুটি এবং নতুন ফৌজদারি মামলার জন্য ১০টি বেঞ্চকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন নিষ্পত্তির দিন ধার্য করা হয়েছে। আদালত প্রশাসন ও মামলা ব্যবস্থাপনায় তদারকি, বেঞ্চ পুনর্গঠন, বেঞ্চের এখতিয়ার সুস্পষ্ট করে দেওয়ার ফলে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তির হার বেড়েছে। ২০১১ সালে ৯৪৮৯৮৯ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে কিন্তু অপর দিকে ১ জানুয়ারী ২০১২ পর্যন্ত ২১৩২০৪৬ টি অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় রয়েছে।[৪০] বাংলাদেশের বিচার প্রশাসনে উন্নততর মামলা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিতকরণের জন্য জনগণের আইনগত তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিচার প্রার্থীদের জন্য অল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে বিচারাধীন মামলার তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অনলাইন কজলিস্ট ব্যবস্থাপনা এবং জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহের জন্য ওয়েব পোর্টাল (www.bdcourts.gov.bd) প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহের ওয়েব পোর্টালটি এখনও কার্যকর নয়। এছাড়া কোর্ট ফি'র হারের সামঞ্জস্যতা বিধান করার লক্ষ্যে কোর্ট ফি আইন সংশোধন করা হয়। এছাড়া দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের মামলা সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিচার বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ দ্রুত ও সঠিক তদন্ত করে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।[৪১]

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও নিম্ন আদালতের ওপর প্রশাসনের প্রভাব রয়ে গেছে। একইভাবে উচ্চ আদালতে নিয়োগ পদন্নোতির ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা লংঘন ও রাজনৈতিক প্রভাবের মত অভিযোগ রয়েছে। উচ্চ আদালতে নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। এছাড়া এখনো বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন করা হয়নি এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে নিম্ন আদালতের প্রশাসনিক বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। বিচারকদের বেতন-ভাতার বিষয়ে পে-কমিশনকে সহায়তার জন্য গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কারিগরি কমিটির সুপারিশও বাস্তবায়িত হয় নি। এছাড়া নিম্ন আদালতের বিচারকদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, জনবল ও যানবাহন-ব্যবস্থা পুরোপুরি নিশ্চিত করা যায় নি। বিচারকদের অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ২০০৯ সালে তা অনুসরণ করা হয়

---

[৩৬] সুপ্রিম কোর্টে ১৫ বছরের মামলা পুরোনো বিচারাধীন মামলা ৩৮ হাজার, *প্রথম আলো*, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০।

[৩৭] সুপ্রিম কোর্টে নথি সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যেগ, *প্রথম আলো*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

[৩৮] সুপ্রিম কোর্টে মামলা নিবন্ধনে ই-রেজিষ্ট্রারিং পদ্ধতি চালু, *প্রথম আলো*, ২ জানুয়রি ২০১১।

[৩৯] বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে টিআইবির সুপারিশ, পলিসি ব্রিফ, টিআইবি।

[৪০] Address of the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh Mr. Justice Md. Muzammel Hossain on the occasion of National Case Management Workshop in Dhaka to be held in the Ball Room of Ruposhi Bangla Hotel on 7 December 2012.

[41] http://www.minlaw.gov.bd/images/success_bangla.pdf

নি।[৪২] এর বাইরেও নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, বিভাগীয় নানা সুবিধা নিয়ে তদবির করা হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে জামিন দেওয়া কিংবা না দেওয়া, রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর বা না মঞ্জুর ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ পাওয়া যায়।[৪৩]

অন্যদিকে নানমুখী পদক্ষেপ গ্রহন স্বত্তেও দুর্নীতি বিচার ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ২০০২, ২০০৫, ২০০৭, ২০১০ ও ২০১২ সালের টিআইবি'র খানা জরিপে তথ্যদাতারা এ খাতকে অন্যতম প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করে। এসকল জরিপে দেখা যায়, সেবাগ্রহীতাদের ঘুষ প্রদান, উকিল, মুহুরী, দালাল কর্তৃক হয়রানি, কাগজপত্র উত্তোলনে হয়রানিসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে।[৪৪] ২০১০ সালে টিআইবি'র এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগ সম্পর্কিত অভিযোগ মূল্যায়ন করার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি উচ্চ আদালতের পাঁচজন সম্মানিত বিচারপতির সমন্বয়ে এক কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে ছিল টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত জরিপ প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে বিচার বিভাগের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩.৪. সম্পদ পুনুরুদ্ধার

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের অনুচ্ছেদ ১৪ ও অনুচ্ছেদ ২৩ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের ৫১ থেকে ৫৯ নং অনুচ্ছেদে সম্পত্তির পুনরুদ্ধার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই সনদের ১৪ নং অনুচ্ছেদে টাকা পাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থাসমূহ এবং ২৩ নং অনুচ্ছেদে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের পাচার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়া ৫১ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে সম্পত্তির হিসাব বিবরণী সনদের একটি মূলনীতি এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ একে অপরকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করবে। সনদের ৫২ নং অনুচ্ছেদে অপরাধের দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি হস্তান্তর প্রতিরোধ ও শনাক্তকরণ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। সনদের ৫৩ নং অনুচ্ছেদে সম্পত্তি পুনুরুদ্ধারের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ, ৫৪ নং অনুচ্ছেদে বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার এবং ৫৫ নং অনুচ্ছেদে বাজেয়াপ্তকরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এছাড়া সনদের ৫৬, ৫৭, ৫৮ এবং ৫৯ নং অনুচ্ছেদগুলোতে যথাক্রমে বিশেষ সহযোগিতা, সম্পত্তি ফেরত এবং বন্টন, আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা ও দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি এবং বন্দোবস্ত সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

৩.৪.১. বাস্তবতা

দেশীয় আইনসমূহ জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের এই অনুচ্ছেদগুলোর সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানকারী উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হচ্ছে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পাস্পরিক সহায়তা আইন ২০১২, ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (সংশোধন) ১৯৫৮, সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন ২০১২, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৭, দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮, জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭। এছাড়াও জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে প্রদত্ত নোটিফিকেশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার, গাইডেন্স নোট ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ উদ্ধারের বিষয়ে বিস্তারিত আইনী কাঠামো রয়েছে।

বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে সম্পত্তির পুনুরুদ্ধার সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধানাবলি রয়েছে। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের এই বিধানগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনটিকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া সম্প্রতি অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পাস্পরিক সহায়তা আইন ২০১২ প্রণীত হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অপরাধমূলক কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি ফ্রিজ বা আটক সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান বা গ্রহনে আইনী পদক্ষেপ নিতে পারবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম ২০০২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের দূর্বলতাসমূহ দূরীভূত করার জন্য ২০০৮ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ প্রণীত হয় এবং ২০০৯ সালে সংসদে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯ পাশ হয়। সম্প্রতি এই আইনে আবারো প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ পাশ করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে ফ্যান্যন্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইফনিট (এফ আই ইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আইন অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত মামলা তদন্ত ও পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

---

[৪২] *ডেইলি স্টার*, ৩ আগস্ট ২০০৯।

[৪৩] নীতি গবেষণা কেন্দ্র (এনজিকে), 'জুডিশিয়ারি ইন বাংলাদেশ: রিভিউ ২০০৯', ২০১০।

[৪৪] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, টিআইবি'র সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০।

অন্যদিকে জাতিসংঘ সনদসমূহের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ মানি লন্ডারিং ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাস বিরোধী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং আর্থিক সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্য জাতীয় কৌশল ২০১১-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কৌশলগুলো হলো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক সন্ত্রাস মোকাবেলার আইনী কাঠামো জোরদার করা, ফ্যান্যন্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের কার্যকরতা বৃদ্ধি, সকল রিপোর্টিং এজেন্সিগুলোর কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা, মানি লন্ডারিং এবং অর্থনৈতিক সন্ত্রাসের পথ খুজে বের করার পদ্ধতি ও কৌশলের জন্য কাঠামোগত উন্নয়ন ও সামর্থ বৃদ্ধি করা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক সন্ত্রাস মোকাবেলার ওপর অর্থনৈতিক রিপোর্টিং এ স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, নীতি নির্ধারনী ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে জাতীয় সমন্বয় বৃদ্ধি, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক সন্ত্রাস মোকাবেলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহায়তা বৃদ্ধি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

আইন অনুযায়ী বিচারিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন ইতিমধ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এর অধীনে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসহ বেশ কিছু মামলা দায়ের করেছে।[৪৫] অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক বেশকিছু সংখ্যক তদন্ত শুরু হয়েছিল এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পদের খোঁজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছিল। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ও দুর্নীতি দমন কমিশন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেছিল।[৪৬] সামরিক মদদপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের এবং ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা দায়ের করেছিল। নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এই কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বিশেষ আদালতের দেওয়া অনেক সাজা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে এবং সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টে এসে খারিজ হয়ে যায়। অল্প কিছু সংখ্যক মামলা এখনও আপীলে রয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো জরুরি অবস্থায় যথাযথ বিচারিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এছাড়া ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন সময়ে মালয়শিয়া, থাইল্যান্ডেসহ বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করে থাকে এবং সেকেন্ড হোম হিসেবে এদেশগুলো অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন আইনী ও পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে এই অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকার (২৭ এপ্রিল ২০০৮ তারিখের ইউএন-এসওসি-৬০২৭/০৭ গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে) সম্পত্তির পুনুরুদ্ধারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে মনোনীত করেছে এবং জাতিসংঘের মহাসচিবকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে করা জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো দেশের নিকট হতে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার জন্য প্রাপ্ত কোনো অনুরোধের বিষয়ে বাংলাদেশ সাড়া দিতে পারবে। এরূপ সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশীয় কোনো আইন বাধা হবে না। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ২৬ ধারা অনুযায়ী অর্থ পাচার প্রতিরোধের জন্য সরকার বা কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশী রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে পারবে বা দ্বি-পাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবে। এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর হলে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য দেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে অনুরোধ বা তথ্য প্রদান করতে পারবে যদি তা জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত না করে। এছাড়া বাংলাদেশ দশটি দেশের সাথে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতা চুক্তি করেছে। যদিও বাস্তবে এধরনের সম্পত্তির পুনুরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সফলতার নজির খুবই কম। তবে সম্প্রতি প্রথমবার ১৩ কোটি পাচারকৃত টাকা সিঙ্গাপুর থেকে ফেরত এসেছে। তবে সরকারি কাজে এ টাকা ব্যবহার করা হবে এমন শর্তে তা ফেরত আনা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতে বিদেশে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা একটি কঠিন আইনী লড়াই কারণ টাকাটা যে পাচারকৃত টাকা তা প্রমাণ করা বেশ দুঃসাধ্য । এছাড়া অন্য দেশের সরকারকে পাচারকৃত টাকার খোঁজ দিতে রাজী করানোও একটি কঠিন কাজ। যেমন পাচারকৃত টাকাকে মুদ্রা পাচার বলতে একেবারেই নারাজ মালয়শিয়া, তাই ওভার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে টাকা পাচার হয়েছে এমনটি জানার পরও সে টাকার হদিস পাচ্ছে না বাংলাদেশ ব্যাংক।[৪৭]

অন্যদিকে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের এগমন্ট গ্রুপের[৪৮] সদস্য হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি/স্মারক পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম উন্নত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এর মাধ্যমে এক দেশ হতে অন্য দেশে অর্থ পাচার পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পরিবীক্ষণের জন্য বাংলাদেশের কিছু প্রযুক্তিগত দুর্বলতা রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৪)।

---

[৪৫] *দি ডেইলি স্টার*, সেপ্টেম্বর ৩, ২০১১

[৪৬] *দি ডেইলি স্টার*, জানুয়ারি ১, ২০০৮

[৪৭] পাচার হওয়ার টাকা ফেরত আনার কঠিন লড়াইয়ে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক, চ্যানেল আই, ২৫/১/২০১৩।

[৪৮] প্রাগুক্ত

সম্পদ উদ্ধার প্রক্রিয়াটি বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। প্রতিটি দেশই সম্পদ পাচার সমস্যার মোকাবিলা করতে নানা আইনী জটিলতা, আন্তর্জাতিক অসহযোগিতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে প্রাথমিক আইনী কাঠামো তৈরি হয়েছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের দিক থেকে ধারাবাহিক দৃঢ় অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না। এর ফলে বাস্তবে সম্পদ উদ্ধারে এখনও উল্লেখযোগ্য সফলতা আসেনি। এছাড়া যে দল ক্ষমতায় থাকবে সেই দল সকল ক্ষমতা তার প্রয়োজনে প্রয়োগ করবে-এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনকেও রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[৪৯]

৩.৫. রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের সরকারি খাত সম্পর্কিত ৭ (২) নং অনুচ্ছেদে[৫০] সরকারি পদে প্রার্থিতা ও নির্বাচনের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণে এবং ৭ (৩) নং অনুচ্ছেদে[৫১] নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

৩.৫.১. বাস্তবতা[৫২]

দেশীয় আইনসমূহ জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের এই শর্তসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে। সংবিধানের ৬৫ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হবে। সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। এছাড়া সংবিধানের ১১৮-১২৬ অনুচ্ছেদে নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণের আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর। এই অনুচ্ছেদসমূহে নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, ভোটার তালিকায় নামভুক্তি, নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়, নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা, নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের তদারকি এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ এবং 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯' এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-এর 'অধ্যায় ৩ ক' অনুযায়ী, কোনো একজন প্রার্থীর নির্বাচনের ব্যবস্থা, পরিচালনা অথবা তার সুবিধার জন্য কিংবা নির্বাচনের সাথে জড়িত অথবা প্রাসঙ্গিক কাজের জন্য ব্যয়িত যে কোনো খরচ অথবা দান, ঋণ, অগ্রিম, আমানত হিসাবে কিংবা ভিন্ন নামে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা পরিশোধিত খরচই নির্বাচনী ব্যয় (ধারা ৪৪ক)। এছাড়াও এই অধ্যায়ে প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের আওতা এবং অর্থের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণ (ধারা ৪৪কক)[৫৩],

---

[৪৯] সরকার দুর্নীতি ও অন্যান্য অপরাধের মামলাসমূহ পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। সরকারি দলের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রায় ৬,৬৬৫টি মামলা প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*

[৫০] জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ৭ (২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় মৌলিক আইন কাঠামো, প্রচলিত আইন এবং এই সনদের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রজাতন্ত্রের সরকারি পদে প্রার্থীতা ও নির্বাচনের অনুসরণীয় মানদণ্ড নির্ধারণে যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

[৫১] জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ৭(৩) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র এই সনদের উদ্দেশ্য ও দেশীয় আইনের মৌলিক নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে গণপ্রতিনিধিত্বকারী পদসমূহে নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

[৫২] রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়ে টিআইবি'র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গবেষণা রয়েছে। এই সকল গবেষণা প্রতিবেদনের মধ্যে দুটি প্রতিবেদন হতে সরাসরি এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, শাহজাদা এম আকরাম, সাধন কুমার দাস, ও তানভীর মাহমুদ, *রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, টিআইবি ২০০৯ এবং শাহজাদা এম আকরাম ও সাধন কুমার দাস, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা*, টিআইবি, ২০১০।

[৫৩] 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯, ধারা ৪৪কক অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় নির্বাচনী খরচ মেটানোর জন্য অর্থের সম্ভাব্য উৎসগুলোর একটি বিবরণ নির্ধারিত ফরমে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে। এর মধ্যে আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ বা চাঁদা হিসাবে প্রাপ্ত টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। এর সাথে অবশ্যই প্রার্থীর সম্পদ, দায়-দেনা, বার্ষিক আয় ও ব্যয়, এবং আয়কর রিটার্ন এর কাগজপত্র নির্ধারিত ফরমে জমা দিতে হবে।

নির্বাচনী ব্যয়ে নির্বাচনী এজেন্টের ভূমিকা [ধারা ৪৪খ (১)][৫৪], নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ উর্ধ্বসীমা [ধারা ৪৪খ (২)][৫৫], নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমাদান (ধারা ৪৪গ)[৫৬] এবং নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ [ধারা ৪৪গ (৩)][৫৭] সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯' অনুসারে প্রধানত রাজনৈতিক অনুদান গ্রহণ ও নির্বাচনে ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং সার্বিকভাবে রাজনৈতিক অর্থায়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ২০০৯ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের সাথে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চিতকরণে সরাসরি সম্পৃক্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। এই কমিশনের পক্ষে সাংবিধানিক ম্যান্ডেট এবং সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী আইন ও বিধি-বিধান থাকা সত্ত্বেও এই সকল রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে খুব সামান্যই পদক্ষেপ নিতে পারছে। প্রকৃত পক্ষে এ সংক্রান্ত অনেক আইন হলেও সেগুলো বাস্তবায়নে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ: ২০০৭ সালে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকে অবাধ ও মুক্ত করতে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জাতীয় পরিচয় পত্রসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস, রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ সংশোধন, নির্বাচনী আচরণ বিধি আরও কঠোর করা, অবাধ নির্বাচনের প্রতি ব্যাপক জনমত গঠন করা, সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা। এর ফলে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ছিলো। নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণের অঙ্গীকার আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও ছিল।[৫৮] আর তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গঠিত নির্বাচন কমিশন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনী আইন সংস্কারের ধারা অব্যাহত রাখে, এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করে।

প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় নিরীক্ষা: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি, এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করেনি। টিআইবি'র একটি গবেষণায়[৫৯] (২০১০) দেখা যায়, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা খুব কমই নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনজনিত শাস্তির সম্মুখীন হয়েছেন।[৬০] তবে সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিশেষভাবে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এবং নরসিংহী পৌরসভা নির্বাচনে নির্বাচনী আচরণ বিধিমালার অধীনে নির্বাচনী প্রচারণায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিষয়ে পূর্বের ধারার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা' (২০১০) শীর্ষক টিআইবি'র একটি গবেষণায় বাংলাদেশের অবস্থান মধ্যম এবং আশাব্যঞ্জক বলে বিবেচিত হয়েছে। তারপরও হিসাবরক্ষণ, প্রতিবেদন দাখিল, প্রতিবেদনের নির্ভরযোগ্যতা, তথ্য প্রকাশ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশন অনেক পিছেয়ে আছে।

---

৫৪ 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯, ধারা ৪৪খ (১) অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ ছাড়া প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর জন্য কোনো ব্যক্তি ঐ প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া অন্য কাউকে কোনো অর্থ দিতে পারবে না, এবং প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর কোনো নির্বাচনী খরচ করতে পারবে না।

৫৫ 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯, ধারা ৪৪খ (২) অনুযায়ী নির্বাচনী ব্যয় ১৫ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবে না।

৫৬ 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯, ধারা ৪৪গ অনুযায়ী নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত হিসাব সকল রশিদ এবং বিলসহ প্রতিদিন অর্থ পরিশোধের একটি বিবরণীসহ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে হবে।

৫৭ 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯, ধারা ৪৪ঘ (৩) অনুযায়ী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

৫৮ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ।* ইশতেহারে বলা হয়, "নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার অব্যাহত থাকবে" (প্যারা ৫.৩); "প্রবাসী বাঙালিদের জাতি গঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হবে..." (প্যারা ৫.৫)

৫৯ শাহজাদা এম আকরাম ও সাধন কুমার দাস, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা*, টিআইবি, ২০১০।

৬০ ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৪০টি আসনে প্রার্থীদের ওপর নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষায় তাদের নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘনের চিত্র উঠে আসে। নির্ধারিত সময়ে ও বেশি সময় ধরে মাইকিং ও অতিরিক্ত মাইক ব্যবহার, পোস্টার সাঁটানো, রঙ্গিন পোস্টার ছাপানো, মোটর সাইকেল বা বাস র‍্যালি, ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ, এবং ভোটার ও কর্মীদের আপ্যায়নের পাশাপাশি নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত খরচ উল্লেখযোগ্য। এসব আসনে ৮৮ জন প্রার্থী নির্ধারিত সর্বোচ্চ উর্ধ্বসীমার চেয়ে গড়ে প্রায় ৩১ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় করেন। অথচ এই প্রার্থীরাই তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে গড় ব্যয় দেখিয়েছেন প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

অনুদান সংক্রান্ত তথ্যে প্রবেশাধিকার: 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ এবং 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯ এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে তহবিল গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, এবং অনুদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এসব আইনে দল এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার পুরোপুরি নিশ্চিত করা হয় নি। সংবাদ-মাধ্যম এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও রাজনৈতিক অনুদান সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নয়।

নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ: নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস জনগণের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। তবে দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

নির্বাচনী রিটার্নের সত্যতা যাচাই: দেশের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তীতে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক জমাকৃত নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন বা প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করেনি, এবং এর প্রয়োজনীয় তদারকি ও নিরীক্ষা ব্যবস্থাও নেই। ফলে প্রার্থীরা নির্ধারিত সীমার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করে এবং পরবর্তীতে এই সীমার মধ্যেই হিসাব জমা দেয়।

নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনজনিত শাস্তি: কোনো দলই দলীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মমাফিক সংরক্ষণ করে না, এবং এখন পর্যন্ত কোনো দলই তাদের হিসাবের স্বতন্ত্র ও বাহ্যিক নিরীক্ষা করেনি। নির্বাচনী আইন ও বিধি লঙ্ঘনের জন্য পরিষ্কারভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘনের জন্য বেশ কিছু শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারলেও রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে পারে নি।

রাজনৈতিক অর্থায়নের স্পর্শকাতরতা: রাজনৈতিক অর্থায়ন এখনও একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যেখানে দলগুলো সচরাচর তাদের নিজেদের কর্মীদের কাছেই আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করে না। আর্থিক অনুদান কখনও কখনও সরাসরি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এসব অনুদান প্রায়ই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামনে রেখে স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়ে থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে জোরপূর্বক সংগ্রহ করা হয়। জানা যায়, একটি বড় অংকের অর্থ নির্বাচনে মনোনয়ন লাভকারী প্রার্থীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। নির্বাচনে জোট গঠনের মাধ্যমেও তহবিল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের তহবিলের কথা নির্বাচন কমিশনসহ সাধারণ জনগণ জানতে পারে না।

৪. সনদ বাস্তবায়নে সুশীল সমাজের ভূমিকা

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ-এর ১৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র তার সামর্থ্যের মধ্যে এবং দেশীয় আইনের মৌলিক নীতিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারি ক্ষেত্রের বাইরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং দুর্নীতির অস্তিত্ব, কারণ ও গভীর ক্ষতিকারক ফলাফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যক্তি বা দলগত পর্যায়ে সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা ও সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুশীল সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষর করে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ও অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন অনুমোদন, 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়নসহ নানা আইনী সংস্কারের পেছনে সুশীল সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। একইভাবে তাদের দাবীর অংশ হিসেবে দেশে মানবাধিকার কমিশন এবং তথ্য কমিশনও গঠিত হয়।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে বাংলাদেশ অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর থেকে টিআইবি, আইজিএস এবং গণমাধ্যমের সাথে সাথে আরো কয়েকটি সিএসও সনদ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কমপ্লাইয়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ এনালাইসিস, সনদ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, আন্তর্জাতিক, জাতীয়, ও স্থানীয় পর্যায়ে ক্যাম্পেইন, সনদ বাস্তবায়নের ওপর ছায়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি। টিআইবি ছাড়াও বাংলাদেশ এনজিও নেওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি), রাইটস যশোর এবং ভয়েস জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ কোয়ালিশন-এর সদস্য হয়েছে। কয়েকটি দাতা সংস্থাও আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। উদাহরণস্বরূপ, জিআইজেড-এর আর্থিক সহায়তায় এবং আইজিএস-এর কারিগরি সহায়তায় বিসিজিএ করা হয়। এ কাজে বাসেল ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স, ইউএনওডিসি এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করে। সনদ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে জিআইজেড সরকারের সাথে কাজ করছে। এই সনদের ওপর টিআইবি'র কাজকে আর্থিকভাবে সহায়তা দিচ্ছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ডেনিশ ইন্টারন্যাশনাল

ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ডানিডা), সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) অ্যান্ড সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি)।

সুশীল সমাজ বা সিবিও-দের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ, কর্ম-পরিকল্পনা বা প্রচারণা থাকলেও [যা সনদের ১৩ (১) অনুচ্ছেদের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ] সরকারের দিক থেকে সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করে কাজ করার মানসিকতায় এখনো ঘাটতি রয়েছে। জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়নের ওপর কান্ট্রি রিপোর্ট প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সরকার প্রাথমিকভাবে সুশীল সমাজ বা টিআইবিকে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহ দেখায়নি, যদিও পরবর্তীতে টিআইবিসহ সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের ওপর সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

৫. সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ঘাটতির মূখ্য কারণসমূহ

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট ও বিশদ দেশীয় আইন রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারও রয়েছে। তারপরও এই সকল আইন,বিধি-বিধান, অঙ্গীকার বাস্তবে প্রয়োগ করতে না পারার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কারণগুলোকে মোটা দাগে চিহ্নিত করা যায়:

- **দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা ও প্রভাব:**
  দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা প্রায়শই দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপসমূহকে প্রভাবিত করে। এটি অব্যাহতির সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়ে সততা ও আন্তরিকতার পরিচয় দেন না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপগ্রহনকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সবসময় ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারি চাকরি নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন এবং বদলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের মুখাপেক্ষী হতে হয়। অনেক সরকারি কর্মকর্তাকে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি)[৬১] করে রাখা হয় যা দলীয়করণের সামিল।
  এছাড়া, সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংকের পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিলের ঘটনায় এরই বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় যেখানে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের দিক থেকে অনুসন্ধানে ঘাটতি দেখা যায় এবং তাঁকে রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত আশ্রয় দেওয়া হয়।[৬২]
- **দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকারিতার অভাব:**
  দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণবিধি না থাকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা, অধ্যাবসায়ের অভাব সংক্রান্ত কিছু উদ্বেগ রয়েছে। এই বিষয়গুলো দুর্নীতি দমন কমিশন ও তদন্তের সামর্থ্যের অকার্যকরতা প্রকাশ করে।[৬৩] এছাড়া সরকার আইনী সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনকে একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় যা এই কমিশনের গতিশীলতা শ্লথ করে দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে পদ্মাসেতু ইস্যুতে বিশ্বব্যাংকের কঠোর অবস্থান গ্রহনের সাথে সাথে সরকারের অবস্থান পরিবর্তন এবং দুদকের পদক্ষেপ গ্রহনের ক্ষেত্রেও একই সাথে পরিবর্তন একথাই প্রমাণ করে যে দুদক এখনও একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত স্বকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দুর্বলতা বা ঘাটতি:**
  দেশের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে জনবল ঘাটতি, সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রযুক্তিগত সামর্থের ঘাটতি রয়েছে। এই বিষয়গুলো আইন প্রয়োগ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি সামর্থ্যকে দুর্বল করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের সামর্থ্য নিশ্চিত না করা বিশেষ করে জনবলের জন্য সরকার সমালোচিত হয়েছে।[৬৪] তথ্য অধিকার আইন ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট

---

[৬১] সরকার সরকারি আদেশের মাধ্যমে জনস্বার্থ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, দুর্নীতির অভিযোগ ইত্যাদি কারণে একজন সরকারি কর্মকর্তাকে তিন মাস সময়ের জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ওএসডি হিসেবে পদায়ন করতে পারে। এ অবস্থায় একজন সরকারি কর্মকর্তা বেতনভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা পাবেন কিন্তু তার কোনো দায়িত্ব বা কার্যালয় থাকবে না। বাস্তবে সরকারি কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক বিবেচনায় ওএসডি করা হয় এবং এর মেয়াদ অনেককাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সরকারের সময়েও এ ধারা বহাল আছে। বর্তমান সরকারের সময়ে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ৬০০ কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, প্রাগুক্ত।

[৬২] বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রেসিডেন্ট জানান যে দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে একাধিকবার জানানো হলেও বাংলাদেশ সরকার দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণে তারা পদ্মা সেতু প্রকল্প বাতিল করছেন। এদিকে প্রকল্পের প্রধান দাতাসংস্থা বিশ্বব্যাংক ঋণচুক্তি বাতিল করায় অপর দাতা সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও ঋণ সহায়তা থেকে সরে গিয়েছে।

[৬৩] *দি ডেইলি স্টার, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১০।*

[৬৪] উভয় কমিশনের চেয়ারম্যান জনসম্মুখে কমিশনগুলোর প্রয়োজনীয় জনবল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বিলম্বের বিষয় সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

তথ্য প্রকাশকারীর (সুরক্ষা) প্রদান আইন প্রণয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলেও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। সরকার ন্যায়পাল সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান বাস্তবায়ন করতে ব্যার্থ হয়েছে। একইভাবে কর ন্যায়পাল আইন বিলোপের মাধ্যমে কর ন্যায়পালের বিলুপ্তি করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ছিল।

- **তথ্যের অবাধ প্রবাহের সীমাবদ্ধতা:**
  সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বল তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যের প্রাপ্যতা সীমিত। এছাড়া তথ্য সরবরাহকারীর সক্ষমতারও অভাব রয়েছে। সরকারি তথ্য প্রদানে গররাজি থাকার পেছনে রয়েছে সরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তার সংস্কৃতি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সচরাচর আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় না। তবে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের তথ্য অন্য কাউকে প্রদানও করে না।
- **জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ সম্পর্কে প্রচারণা ও সচেতনতার অভাব:**
  জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ সম্পর্কে প্রচারণা ও জনসচেতনতার অভাব রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পর্যায়েও এ সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সরকারি কর্মকর্তারা এ সম্পর্কে সচেতন নয়।
- **ফোকাল পয়েন্ট এর কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সক্রিয়তা ও সক্ষমতার ঘাটতি:** সনদে অন্তর্ভুক্তির পর থেকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব (আইন প্রণয়ন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ) বাংলাদেশে সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিক ও প্রযুক্তিগত ঘাটতি রয়েছে। একক ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যের আদান প্রদান, সনদ সম্পর্কে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি, সনদ বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ তথা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন তার জন্য অত্যন্ত দূরহ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে রয়েছে অন্তঃ- ও আন্তঃ-সম্পর্কীয় সমন্বয়ের অভাব।
- **সুশীল সমাজের ভূমিকা পালনে বাধা:**
  দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশীল সমাজকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে দেওয়ার পরিবর্তে সরকারের পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রেই অসহনশীলতার বহিঃপ্রকাশ যা সুশীল সমাজের ভূমিকা হ্রাস করে। সুশীল সমাজ ও একাধিক বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে সনদ বাস্তবায়নে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ, কর্ম-পরিকল্পনা বা প্রচারণা থাকলেও মুষ্টিমেয় কিছু ইতিবাচক দৃষ্টান্ত ছাড়া সরকারের দিক থেকে সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করে কাজ করার মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে

৬. উপসংহার ও সুপারিশ

বাংলাদেশে উন্নয়ন, সুশাসন, দারিদ্র দূরীকরণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রধানতম অন্তরায় দুর্নীতি। দুর্নীতিমুক্ত স্বদেশের স্বপ্ন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলাদেশ। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের সফল বাস্তবায়ন হলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা সর্বোপরি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পাবে। বাংলাদেশে এই সনদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কিভাবে সরকার কার্যকর ও সমন্বিত উপায়ে এটি বাস্তবায়নে কাজ করবে তার ওপর। একইসাথে দুর্নীতি রোধে প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করার ক্ষেত্রে কতটা স্বাধীনতা ও সুযোগ পাচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতি রোধে প্রতিরোধমূলক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইত্যাদি। এসব মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাধান্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশ কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে বলে টিআইবি মনে করে।

১. **জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকতে হবে।**
   - ভয়ভীতির উর্ধ্বে আইন প্রয়োগের সামর্থ্যের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা।
   - জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সনদ বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যতামূলক।
   - জাতীয় সংসদ জনপ্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগের মত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে, পেশাগত সততার সাথে, স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

২. দুদককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে এবং দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য করতে হবে।

- যেকোনো প্রকার দুর্নীতিকে আইন ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। আইনকে কোনোভাবে প্রভাবিত বা বিঘ্নিত না করে একে নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে।
- দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো কার্যকর করতে হবে এবং এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং দুদক–কে পরিপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করতে হবে।
- সংসদে বিবেচনাধীন খসড়া সংশোধনী আইনটি প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে অনতিবিলম্বে অনুমোদনের উদ্যোগ নিতে হবে।
- দুদক–কে তার নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, সকল পর্যায়ের কর্মী নিয়োগ এবং বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয়ের পূর্ণক্ষমতা দিতে হবে। দুদক–এর বাজেটকে সরকারের দায়যুক্ত তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- দুদক–এর আইনি ক্ষমতাকে বিস্তৃত করে সকল প্রকার আর্থিক অপরাধ, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশী কোম্পানি এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সম্পর্কিত অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রয়োজন নিরূপণ করে দুদক–এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
- দুদক এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের আয় সম্পদ ও দায়–এর হালনাগাদ বিবরণ নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে ।

৩. বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে।

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত ও সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, জনগণকে সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার প্রদান এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে এবং সৎ, মেধাবী, সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ ব্যক্তিদের স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও প্রভাব বর্জিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারক হিসেবে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।
- বিচারিক সেবার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সামর্থ বৃদ্ধি করতে হবে। বিচারক এবং আইনজীবীরা আচরণবিধি ভঙ্গ করলে যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়ায় সংশোধন, প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বিচারপ্রার্থীরা আইনজীবী, আইনজীবী সহযোগী এবং দালাল দ্বারা যাতে কোনো প্রকার হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার না হয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বার ও আইনজীবী সমিতিকে সক্রিয় হতে হবে।
- বিচার বিভাগের জন্য নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন করতে হবে, যা বিচার ব্যবস্থায় পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- বিচার ব্যবস্থার মানোন্নয়নে বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে আদালতভিত্তিক নাগরিক সনদ প্রণয়ন এবং এর সুস্পষ্ট প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিটি আদালতে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির মাধ্যমে আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও অধিকতর কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।

৪. রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতিফলন হিসেবে স্বচ্ছ এবং সুসংগঠিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত। এই লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল সংগ্রহ, বাজেট প্রণয়ন, ও আয়-ব্যয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত।
- নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত তাদের আয়-ব্যয়সহ সার্বিক হিসাবরক্ষণ ও প্রতিবেদন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া।
- গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোকে গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে দলীয় সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে আলোচনা, উন্মুক্ত এবং অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন, এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ জনগণের জন্য আর্থিক তথ্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে।

- রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী আইন অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদানের বাধ্যবাধকতা কার্যকর করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণসহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। নির্বাচন কমিশনে প্রদত্ত এরূপ প্রতিবেদনের অনুলিপি বাধ্যতামূলকভাবে দলীয় কার্যালয়ে প্রদানের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে তা দলীয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছে উন্মুক্ত করতে পারে।

৫. সম্পদ পুনরুদ্ধারে সরকারকে ধারাবাহিক উদ্যোগ নিতে হবে।

- পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। এক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং আইন এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্য প্রনীত জাতীয় কৌশল ২০১১-২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ফ্যাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে হবে।
- পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা ও বিশেষ করে ফ্যাইন্যান্সিয়াল অপরাধ সনাক্তকরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ সম্পর্ক উন্নয়নে সরকারের সুস্পষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা থাকতে হবে।

৬. সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

- পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার সুবিধাসমূহ স্বপ্রণোদিতভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।
- সরকারের এখতিয়ার বহির্ভূত কিছু সমস্যা থাকে। কোনো সময়সীমা নির্ধারিত না থাকলে অন্যান্য দেশ সহসা পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার অনুরোধে সাড়া দেয় না। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক তৈরি করতে হবে।
- অন্য সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধকে সম্মান জানানোর জন্য প্রথমে তাদের নিজেদের দেশের আইনসমূহকে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের সাথে সংগতিপূর্ণ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭. আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় বাড়াতে হবে।

- অন্তঃ- ও আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন ও জোরদার করতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তাদের জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ ও এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সরকারি সকল সংস্থায় জনবল এবং তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যেও সমন্বয় জোরদার করতে হবে।

৮. সনদ বাস্তবায়নে প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা হালনাগাদ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

- জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে সরকারের কর্ম-পরিকল্পনায় প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা সহকারে অনেক কাজের বিষয় বর্ণিত আছে এবং সরকারকে প্রস্তাবিত সময়সীমার মধ্যে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে।
- ২০০৮ সালে প্রণীত জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কমপ্লাইয়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিসটিকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে হালনাগাদ করতে হবে।
- যে সকল অনুচ্ছেদের সাথে দেশীয় আইনের সংগতি নেই সেসব অনুচ্ছেদসমূহের সংগতি বিধান করার জন্য এবং উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নতুন এবং সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ ভালোভাবে বাস্তবায়নকারী দেশগুলোর নিকট থেকে মডেল আইন প্রণয়ন, আইনের খসড়া, আইন পরামর্শ বিষয়ে কারিগরি সহায়তা নিতে হবে।

৯. সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

- জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ সম্পর্কে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের সাথে সংগতি প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনগণের কাছে সহজলভ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বিষয়ক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সরকারের পদক্ষেপসহ নানা তথ্য জনগণকে অবহিত করতে হবে।
- জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যকর পদক্ষেপসমূহ নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের সকল বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজসহ জাতীয় সততা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সংসদ, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, অডিটর জেনারেলের কার্যালয় ও গণমাধ্যমের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও নির্ভিকভাবে স্ব স্ব পরিধিতে কাজ করে যাবে এটিই সকলের প্রত্যাশা। তবে সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যতখানি কার্যকর দেখতে চায় এ প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক ততখানিই কার্যকর হবে। অতএব রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন বাংলাদেশে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের সফল বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।

সহায়ক তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী

1. ADB/OECD (2010), The Criminalisation of Bribery in Asia and the Pacific: Framework and Practices in 28 Asian and Pacific Jurisdictions- Thematic Review and Final Report.
2. Akram, Shahzada M, Shadhan Kumar Das, and Tanvir Mahmud, 2010, Political Financing in Bangladesh, Transparency International Bangladesh.
3. Dell, Gillian (2011), The first year of the UN Convention against Corruption Review Process: A civil Society Perspective, Transparency International and UNCAC Coalition.
4. Government of Bangladesh (2008), “UNCAC – A Bangladesh Compliance and Gap Analysis”.
5. Government of Bangladesh (2009), “UNCAC – A Bangladesh Action Plan for Compliance”.

6. Iftekharuzzaman, 2004, "UN Convention against Corruption: The International Instrument in National Interest", Transparency International Bangladesh. (http://www.tibangladesh.org/Documents/IACDpap-ED-Eng.pdf).
7. Iftekharuzzaman, “The UN Convention against Corruption: Implications for Bangladesh What Next?”, Transparency International Bangladesh, 9 December 2007; (http://www.tibangladesh.org/Documents/UNCAC-IACD07.pdf).
8. Transparency International Bangladesh, Position Paper – *Call to Reconsider Anti-corruption Commission (Amendment) Act 2011*, (http://www.ti-bangladesh.org/research/PositionPap010311.pdf)
৯. Zaman, Iftekhar, Shadhan Kumar Das, and Shammi Laila Islam, 2011, UN Convention Against Corruption Civil Society Review: Bangladesh 2011, Transparency International Bangladesh.
১০. National Strategy for preventing Money Laundering and Combating Financing of Terrorism 2011-2013
১১. আকরাম, শাহজাদা এম ও সাধন কুমার দাস (২০১০), নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি।
১২. ইউএনওডিসি, জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ।
১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১০।
১৪. নীতি গবেষণা কেন্দ্র (এনজিকে) (২০১০), জুডিশিয়ারি ইন বাংলাদেশ: রিভিউ ২০০৯।
১৫. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ।
১৬. মজুমদার, বদিউল আলম (সম্পাদিত) (২০০৮), সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, সুজন- সুশাসনের জন্য নাগরিক।
১৭. শারমিন, রুমানা, ফাতেমা আফরোজ, সাধন কুমার দাস, শাহজাদা এম আকরাম (২০১২), সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, টিআইবি।
১৮. সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০ ও ২০১২, টিআইবি।

পরিশিষ্ট-১: কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা

কর্ম পরিকল্পনা	**বর্তমান অগ্রগতি**
আইনী কাঠামোতে পরিবর্তন	
দুর্নীতি দমন আইনের পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ	সংশোধিত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ সংসদে উত্থাপিত কিন্তু পাস হয়নি। কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে অতি সম্প্রতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।
সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ পর্যালোচনা	সংশোধিত সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পাস হয়নি।
সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫	অগ্রগতি নেই

পর্যালোচনা	
সিভিল সার্ভিস আইন প্রনয়ণ	সিভিল সার্ভিস আইন ২০১০ এর খসড়া প্রনয়ণ
তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদানের জন্য আইনী বিধানের প্রবর্তন	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে তবে সাক্ষী সুরক্ষা আইন এখনও প্রণীত হয়নি।
আইন প্রয়োগের জন্য অন্ত:দেশীয় সহায়তা বৃদ্ধি	একটি সমন্বয় এজেন্সি গঠন করা হয়েছে, কিন্তু দৃশ্যত তা খুব একটা কার্যকর নয়।
বিদেশে পলাতক আসামীকে দেশে ফিরিয়ে আনা বিষয়ক আইন পর্যালোচনা	বিদেশে পলাতক আসামীকে দেশে ফিরিয়ে আনা বিষয়ক আইন, ১৯৭৪ পর্যালোচনার জন্য একটি আন্তঃ-মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন এবং এ কমিটি আইনটি সংশোধনের জন্য সুপারিশ প্রদান করেছে কিন্তু এখনও আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এছাড়া বন্দি বিনিময়ের জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পেশ করেছে।
পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার জন্য আইনগত ভিত্তি প্রর্বতন	এছাড়া অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পাস্পরিক সহায়তা আইন ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর সংশোধনের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত করা হয়নি। তবে বাংলাদেশ ১০ এর অধিক দেশের সাথে যৌথ আইনগত সহায়তার (এমএলএ) চুক্তি করেছে।
সরকারি খাতে নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি	হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ পৃথকীকরণের নিমিত্তে বিদ্যমান আইনসমূহ পর্যালোচনার কথা থাকলেও এ বিষয়ে শুধুমাত্র সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।
প্রয়োগ বা চর্চায় পরিবর্তন	
জবাবদিহিতার চর্চা এবং তত্বাবধায়ক ভূমিকা পালন	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই
সরকারি কর্মকর্তাদের প্রণোদনা ও পারিতোষিকের বিধান	বেতন সমন্বয় নীতিমালা অনুমোদন, কর্ম দক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি ও প্রণোদনা নীতি বলবৎ রয়েছে।
সম্পদের বিবরণ পরিবীক্ষণ	ভুয়া সম্পদের বিবরণ ঘোষণার ক্ষেত্রে মনিটরিং পদ্ধতি ও শাস্তির বিধান বলবৎ রয়েছে।
নৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ	সরকারি কর্মকর্তাদের আচারণবিধি ও মূল্যবোধ অনুসরণ ও চর্চার বিষয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
দুর্নীতি দমন আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন	দুর্নীতি দমন আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ।
জবাবদিহিতার চর্চা এবং তত্বাবধায়ক ভূমিকা পালন	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই
সরকারি কর্মকর্তাদের প্রণোদনা ও পারিতোষিকের বিধান	বেতন সমন্বয় নীতিমালা অনুমোদন, কর্ম দক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি ও প্রণোদনা নীতি বলবৎ রয়েছে।
সম্পদের বিবরণ পরিবীক্ষণ	ভুয়া সম্পদের বিবরণ ঘোষণার ক্ষেত্রে মনিটরিং পদ্ধতি ও শাস্তির বিধান বলবৎ রয়েছে।
নৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ	সরকারি কর্মকর্তাদের আচারণবিধি ও মূল্যবোধ অনুসরণ ও চর্চার বিষয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
দুর্নীতি দমন আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন	দুর্নীতি দমন আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ।
জবাবদিহিতার চর্চা এবং তত্বাবধায়ক ভূমিকা পালন	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই
জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত কার্যালয়ের (ইউএনওডিসি) সাথে অগ্রগতি শেয়ার করা	

যেসকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সনদের সাথে সংগতি বিধান করেছে সেসকল বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবকে অবহিত করা এবং নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা।	জাতিসংঘ মহাসচিবকে ইতিমধ্যে অবহিত করা হয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করাও হয়।
সনদের সাথে সংগতি বিধানের জন্য সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ	
জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষনের জন্য জাতীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা	সরকার একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি অনুমোদন করলেও বাস্তবে এর কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয় না।
জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং ও প্রতিবেদন প্রনয়ণের জন্য একটি সমন্বয়কারী কমিটি প্রতিষ্ঠা। এ কমিটি জাতীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষকে প্রদানের জন্য সনদ বাস্তবায়নের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এ কমিটি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য অবহিত করবেন এবং জনগণের কাছে এর অভিগম্যতা নিশ্চিত করবে।	সমন্বয়কারী কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পাক্ষিকভাবে এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাস্তবিকভাবে সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও জনগণের কাছে সহজলভ্য থাকে না।
সমন্বয়কারী কমিটি ও সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ	কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ ও এর বাস্তবায়নের অগ্রগতির তথ্য একটি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, সুশীল সমাজ ও সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণ	অগ্রগতি নেই
সনদের বাস্তবায়ন সহজতর করার জন্য সুশীল সমাজ বা বেসরকারি খাতের সাথে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব গঠন।	বাংলাদেশ কমপ্লাইয়েন্স অ্যান্ড গ্যাপ অ্যানালাইসিস, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা, বাংলাদেশের সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট-এর ওপর পিয়ার রিভিউসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরকার সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনসমূহের এর কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে।
"সনদের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন" এ অংশগ্রহণ	বাংলাদেশ "সনদের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন" এ অংশগ্রহণ করে এবং সনদের অগ্রগতির উপর রিপোর্ট পেশ করে।

পরিশিষ্ট-২: বিশেষ জজ আদালতসমূহে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা, ২০০৪-১০ (বিলুপ্ত হওয়া দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত মামলা)

চলমান মামলা	স্থগিত	সাজাপ্রাপ্ত	খারিজ
১০০৭	৩৫৭	৪৫১	৫৩৬

*দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সংগৃহীত তথ্য (অসম্পূর্ণ)

পরিশিষ্ট-৩: বিশেষ জজ আদালতসমূহে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা, ২০০৪-১০ (দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন হওয়ার পর)

কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত চার্জশীটের সংখ্যা	কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত এফআইআর সংখ্যা	কমিশনের চলমান মামলার পরিসংখ্যান			
		চলমান মামলা	স্থগিত	সাজাপ্রাপ্ত	খারিজ
১৫০৮	৮৫৫	৯৩৬	২৬০	২৩৭	১০০

*দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সংগৃহীত তথ্য (অসম্পূর্ণ)

পরিশিষ্ট-৪:বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম, ২০০৩-১০

দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রমের মামলার মোট সংখ্যা	বিভাগীয় কার্যক্রমের মামলার সিদ্ধান্ত			নিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় কার্যক্রমের মামলার মোট সংখ্যা	অনিস্পত্তিকৃত মামলার মোট সংখ্যা
	সাজাপ্রাপ্ত	অন্যান্য শাস্তি	খারিজ		
১৩৪	৫	৮	৪৮	৬১	৭৩

* সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য: সার্বিক তথ্য পাওয়া যায় নি

পরিশিষ্ট-৫: সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তালিকাভুক্ত মামলা, ২০০৩-১০

উৎকোচের মামলা/ অভিযোগের সংখ্যা	অবৈধ উপার্জনের মামলা/ অভিযোগের সংখ্যা	ক্ষমতার অপব্যবহারের মামলা/ অভিযোগের সংখ্যা	অন্যান্য	তদন্ত সম্পন্ন	চার্জশীটের সংখ্যা	সাজা প্রাপ্তি	খালাস
৪৫	৯৪	২৮	২৩১	২৮৭	১০৬	০৫	৭০

* সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য; সার্বিক তথ্য পাওয়া যায় নি

পরিশিষ্ট-৬: দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫ ধারা অধীনে সাজাসমূহ (শুধুমাত্র বিশেষ জজ কোর্ট, ঢাকা)

বছর	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
ব্যক্তির সংখ্যা	৩	৪	০	১	৩	৫	৮

*দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে সংগৃহীত তথ্য (অসম্পূর্ণ)

পরিশিষ্ট-৭: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭ ধারার অধীনে অবৈধ উপার্জন সংক্রান্ত মামলা (শুধুমাত্র বিশেষ জজ কোর্ট, ঢাকা)

বছর	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
এফআইআর সংখ্যা	০	০	০	১০০	৭০	৩৫	৩০
চার্জশীটের সংখ্যা	০	০	০	৯৩	৫৪	৩৫	১০
সাজা প্রাপ্তির সংখ্যা	০	০	০	৫১	৬	০	০

*দুর্নীতি দমন কমিশন ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য; সার্বিক তথ্য পাওয়া যায় নি